এগারশ অধ্যায়

যে পৃথিবীর শেষ নেই

মহাজাগতিক বিপর্যয় এড়ানোর পথ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আগের অধ্যায়ের শেষে আলোচিত কথাগুলো ছাড়াও আরও কিছু সম্ভাবনা আছে। মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে লেকচার দিতে গেলেই সাধারণত কেউ না কেউ আমাকে চক্রাকার মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনই। মহাবিশ্ব একটি সর্বোচ্চ সাইজ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। তারপর গুটিয়ে মহাসঙ্কোচন ঘটে। কিন্তু পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার বদলে এটি কোনোভাবে লাফিয়ে ওঠে। শুরু করে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের আরেকটি চক্র (চিত্র ১১.১ দেখুন)। এই প্রক্রিয়া হয়ত চিরকাল চলতে পারে। সেক্ষেত্রে মহাবিশ্বের কোনো সত্যিকারের শুরু বা শেষ থাকবে না। প্রতিটি আলাদা আলাদা চক্রের স্বতন্ত্র সূচনা ও শেষ থাকবে যদিও। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত মানুষের কাছে এই তত্ত্বটা বিশেষ পছন্দের। ধর্মগুলোতে জন্ম-মৃত্যু ও সৃষ্টী-ধ্বংসের চক্র জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মহাবিশ্বের শেষের সময়ের জন্যে দুটো খুব আলাদা চিত্রের বর্ণনা দিয়েছি আমি। এর কোনোটাই আশার আলো দেখায় না। মহাধ্বসের মাধ্যমে মহাবিশ্বের নিজেকে ধ্বংস করে দেওয়ার সম্ভাবনা খুব ভয়ঙ্কর কথা। সেটা যত দিন পরেই ঘটুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। অন্য দিকে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বমহিমায় সচল থাকা মহাবিশ্বের অসীম সময় পর্যন্ত মলিন অবস্থায় ফাঁকা হয়ে পড়ে থাকার বিষয়টা অবশ্যই মন খারাপ করে দেবে। কিছু কিছু মডেল থেকে মহাপ্রাণীদের তথ্য প্রসেসের যে অসীম ক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনা দেখা যায় সেটা হয়ত আমাদের উষ্ণ রক্তের মানুষের কাছে শীতল স্বান্তনা মনে হবে।

চিত্র ১১.১

মহাবিশ্বের চক্রাকার মডেল। নিয়মিত বিরতিতে মহাবিশ্বের আকার খুব ঘন ও খুব স্ফীত অবস্থার মধ্যে স্পন্দিত হয়। প্রতিটি চক্রের শুরু হয় একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে। শেষ হয় সঙ্কোচনের মাধ্যমে। সময়ের সাপেক্ষে এটি মোটামুটি প্রতিসম।

চক্রাকার নমুনা এক দিক থেকে খুব লোভনীয়। এতে মহাবিশ্ব পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যগুলো চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এর ক্ষয় ঘটছে না। অবিরাম পুনরাবৃত্তিকে ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করতে হলে প্রতিটি চক্রকে কোনোভাবে অন্য চক্রগুলো থেকে আলাদা হতে হবে। তত্ত্বটির একটি জনপ্রিয় রূপ অনুসারে প্রতিটি নতুন চক্র এর পূর্ব রূপের নির্মম মৃত্যু থেকে ফিনিক্সের১ মতো করে আবির্ভূত হয়। আদিম অবস্থা থেকে এটি নতুন কাঠামো গড়ে তোলে। পরের মহাসঙ্কোচনে সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে এটিও নিজের স্বমহিমা প্রদর্শন করে।

তত্ত্বটাকে দেখে কিন্তু আকর্ষণীয়ই মনে হয়। তবে দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো এতে মারাত্মক কিছু ভৌত সমস্যা আছে। এর একটি হলো, এমন একটি গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া খুঁজে বের করা যা সঙ্কোচনশীল মহাবিশ্বের ঘনত্ব বেড়ে গেলে তাকে মহাসঙ্কোচনের মাধ্যমে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে পুনরায় প্রসারিত করাবে। এর জন্য মহাকর্ষের বিপরীতে কাজ করা কোনো ধরনের বল থাকতে হবে। সঙ্কোচনের শেষের পর্যায়ে যেটি অতিমাত্রায় বড় হয়ে উঠবে। যার ফলে অতঃস্ফোটন প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হবে। প্রতিহত হবে মহাকর্ষের দুমড়ে-মুচড়ে দেওয়ার অদম্য ক্ষমতা। বর্তমানে এমন কোনো বলের কথা জানা নেই। থাকলেও এর বৈশিষ্ট্য হত খুবই অদ্ভুত।

আপনাদের হয়ত মনে আছে, বিগ ব্যাংয়ের স্ফীতি তত্ত্বে ঠিক এমন শক্তিশালী এক বিকর্ষী বলের কথাই বলা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, যে উত্তেজিত ভ্যাকুয়াম অবস্থা থেকে স্ফীতি বল তৈরি হয় সেটা খুবই অস্থিতিশীল। তৈরি হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ধ্বংস হয়ে যায়। অবশ্য এটা সহজেই বোঝা যায় যে ক্ষুদ্র, সরল ও অপক্ব মহাবিশ্ব তো এমন অস্থিতিশীল অবস্থায়ই জন্ম নেবে। কিন্তু জটিল এক ম্যাক্রোস্কোপিক অবস্থা থেকে সঙ্কুচিত হয়ে মহাবিশ্ব সব জায়গায় উত্তেজিত ভ্যাকুয়াম অবস্থা ফিরে পাবে— এমন ধারণা করা একেবারে ভিন্ন কথা। ব্যাপারটা একটা পেন্সিলকে এর অগ্রভাগের ওপর দাঁড় করানোর মতো। পেন্সিলটা খুব দ্রুত কাত হয়ে পড়ে যাবে। পেন্সিলকে আবার আগের মতো মাথার ওপর দাঁড় করানো অনেক কঠিন কাজ হবে।

এ সমস্যাগুলো এড়ানো যাবে ধরে নিলেও চক্রাকার মহাবিশ্বের ধারণায় আরও জটিলতা থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর একটি নিয়ে আলোচনা করেছি। অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ায় চলা সিস্টেমগুলো সসীম হারে চলতে থাকলে সসীম সময়ের মধ্যেই তাদের শেষ অবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে। এই নীতির মাধ্যমেই ঊনবিংশ শতকে মহাবিশ্বের তাপীয় মৃত্যুর পূর্বানুমান করা হয়েছিল। মহাজাগতিক চক্রের ধারণা নিয়ে এলেও এই সমস্যাটি থেকেই যায়। মহাবিশ্বকে ক্রমেই ধীর গতিতে চলা একটি ঘড়ির সাথে তুলনা করা যায়। এক সময় অনিবার্যভাবে এর কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। যদি না এর কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। কিন্তু কোন সে কৌশল যে নিজে অপ্রত্যাগামী পরিবর্তন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে মহাজাগতিক ঘড়ির পুনরাবৃত্তি করাবে?

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে ভৌত প্রক্রিয়াগুলো যেভাবে উল্টোদিকে কাজ করে তেমনিভাবেই মহাবিশ্বের সঙ্কোচন পর্যায় প্রসারণ পর্যায়ের মতোই হবে। বিক্ষিপ্ত হতে থাকা ছায়াপথগুলো কাছে চলে আসতে বাধ্য হবে। শীতল হতে থাকা পটভূমি বিকিরণ আবারও উত্তপ্ত হবে। আর জটিল পদার্থগুলো ভেঙে গিয়ে মৌলিক কণার স্যুপে পরিণত হবে। বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরে মহাবিশ্বের যে অবস্থা ছিল, মহাসঙ্কোচনের ঠিক আগেও প্রায় একইরকম অবস্থা হবে। তবে দেখে এমনটা মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু এটা হবে না। মহাবিশ্বের পেছনে ঘোরার সময়ের জ্যোতির্বিদদের পর্যবেক্ষণ কেমন হবে সেটা থেকে আমরা একটি ধারণা পেতে পারি। সে সময় প্রসারণ বন্ধ হয়ে সঙ্কোচন চলতে থাকবে। ফলে সে সময়ের জ্যোতির্বিদ কিন্তু তখনও দেখবেন, বহু বিলিয়ন বছর ধরে ছায়াপথরা দূরে সরছে। দেখে মনে হবে, মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়েই চলেছে। যদিও আসলে সঙ্কোচন শুরু হয়ে গেছে। এই ভুলের কারণ আলোর বেগ সসীম হওয়ায় সত্যিকার ঘটনা চোখে আসতে সময় লেগে যাচ্ছে।

১৯৩০ এর দশকে কসমোলজিস্ট রিচার্ড টোলম্যান দেখান, কীভাবে এই কারণে মহাবিশ্বের আপাত প্রতিসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কারণটা খুব সরল। মহাবিশ্বের শুরুর সময় বিগ ব্যাং থেকে প্রচুর পরিমাণ তাপ বিকিরণ ধ্বংসাবশেষ হিসেবে থেকে যায়। সময়ের সাথে সাথে নক্ষত্রের আলোর প্রভাবে এই বিকিরণ আরও বাড়ে। কয়েক বিলিয়ন বছর পরে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়া নক্ষত্রের আলোর জমাকৃত শক্তি পটভূমি তাপের সমান হয়। এর অর্থ হলো, সঙ্কোচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় মহাবিশ্বজুড়ে বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরের সময়ের চেয়ে লক্ষ্যণীয় রকম বেশি পরিমাণ বিকিরণ শক্তি উপস্থিত থাকে। ফলে মহাবিশ্ব আবার যখন সঙ্কুচিত হয়ে আজকের অবস্থায় আসবে তখন এর উত্তাপ আরেকটু বেশি থাকবে।

এই বাড়তি তাপশক্তির যোগান দেয় মহাবিশ্বের ভৌত উপাদানগুলো। এটা কাজ করে আইনস্টাইনের E=mc2 সূত্র দিয়ে। তাপশক্তি তৈরি করা নক্ষত্রের ভেতরে হাইড্রোজেনের মতো হালকা মৌলগুলো প্রসেস হয়ে আয়রন বা লোহার মতো ভারী মৌলে পরিণত হয়। সাধারণত আয়রনের একটি নিউক্লিয়াসে ২৬টি প্রোটন ও ৩০টি নিউট্রন থাকে। আপনার হয়ত মনে হবে, তাহলে তো এমন একটি নিউক্লিয়াসের ভর হবে ২০টি প্রোটন ও ৩০টি নিউট্রনের ভরের সমান। কিন্তু না। এভাবে তৈরি নিউক্লিয়াসের ভর আলাদা কণাদুটির মিলিত ভরের ১ ভাগ কম হয়। ভরের এই ঘাটতি হয়েছে সবল নিউক্লিয় বলের বন্ধন শক্তি তৈরি করতে গিয়ে। এই শক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকা ভরটুকুই নক্ষত্রের শক্তি হিসেবে নির্গত হয়।

এতসব কিছুর ফল হচ্ছে বস্তু থেকে বিকিরণে শক্তির নিট রূপান্তর। মহাবিশ্বের প্রসারণ প্রক্রিয়ার ওপর এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে। কারণ বিকিরণে মহাকর্ষীয় টান একই ভর শক্তির পদার্থের টান থেকে একদমই আলাদা। টোলম্যান দেখিয়েছেন, সঙ্কোচন পর্যায়ের বাড়তি বিকিরণের কারণে মহাবিশ্ব গুটিয়ে যায় আরও দ্রুত বেগে। আর কোনোভাবে যদি আরও একবার বিপরীত প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাহলে দেখা যাবে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে আরও দ্রুত হারে। অন্যভাবে বললে, প্রতিটি বিগ ব্যাং আগেরটির চেয়ে বড় হবে। ফলে প্রতিটি নতুন চক্রে মহাবিশ্ব আগের চেয়ে বেশি প্রসারিত হবে। ফলে চক্রগুলো একইসাথে বড় ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। (দেখুন ১১.২ নিং চিত্র)।

মহাজাগতিক চক্রের বৃদ্ধির অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার রহস্যও জানা। এটাও তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের অনিবার্য পরিণতির একটি উদাহরণ। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা বিকিরণের ফলে বাড়ে এনট্রপিও। এর প্রকাশ ঘটে মহাকর্ষীয়ভাবে ক্রমশই বড় থেকে আরও বড় চক্র তৈরির মাধ্যমে। তবে এর মাধ্যমে কিন্তু সত্যিকার অর্থে চক্র বলতে যা বোঝায় তারও অবসান ঘটে। সময়ের সাথে সাথে অবশ্যই মহাবিশ্বে পরিবর্তন ঘটে। অতীতের চক্রগুলো একের পর এক জটিল ও বিশৃঙ্খল সূচনার জন্ম দিয়েছে। আর ভবিষ্যতের চক্র প্রসারিত হবে লাগামহীনভাবে। একসময় এটি এত বড় হবে যে একটি নির্দিষ্ট চক্রের বড় অংশকে চিরপ্রসারমান চিত্রের তাপীয় মৃত্যু থেকে আলাদা করে চেনা যাবে না।

টোলম্যানের কাজের পরেও বিজ্ঞানীরা এমন অন্য কিছু প্রক্রিয়াও খুঁজে পেয়েছেন যা প্রতিটি চক্রের প্রসারণ ও সঙ্কোচনের প্রতিসাম্য নষ্ট করে দেয়। এর একটি উদাহরণ হলো ব্ল্যাকহোলের সৃষ্টি। আদর্শ অবস্থা চিন্তা করলে, মহাবিশ্বের জন্ম হয় ব্ল্যাকহোল ছাড়া। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে নক্ষত্ররা সঙ্কুচিত হয়। আর অন্য প্রক্রিয়ায়ও তৈরি হয় ব্ল্যাকহোল। ছায়াপথের বিবর্তনের সাথে সাথে আরও আরও ব্ল্যাকহোল তৈরি হতে থাকে। সঙ্কোচনের শেষ পর্যায়গুলোতে আরও বেশি ব্ল্যাকহোল তৈরির পরিবেশ তৈরি হয়। কিছু ব্ল্যাকহোল মিলিত হয়ে বড় ব্ল্যাকহোলও তৈরি হয়। ফলে মহাসঙ্কোচনের কাছাকাছি সময়ের মহাবিশ্বের অবস্থা বিগ ব্যাংয়ের পরের সময় থেকে অনেক বেশি জটিল। এটা পরিষ্কার যে সঙ্কোচনের সময় অনেক বেশি ব্ল্যাকহোল থাকবে। মহাবিশ্বের চক্র নতুন করে শুরু হলে পরের চক্র অনেক বেশিসংখ্যক ব্ল্যাকহোল নিয়ে যাত্রা শুরু করবে।

চিত্র ১১.২

অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার কারণে মহাজাগতিক চক্র ক্রমেই বড় হতে থাকে। ফলে একসময় চক্র বলতেই কিছু থাকে না।

ফলে মনে হচ্ছে যে চক্রীয় মহাবিশ্বে এক চক্র থেকে পরের চক্রে ভৌত কাঠামো স্থানান্তরিত হতে পারে তার জন্যে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের বৈশিষ্ট্যক্ষয়কারী প্রভাব এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। এখানেও তাপীয় মৃত্যু ঘটবে। এই হতাশাজনক পরিণতি রোধ করার একটি উপায়ও আছে। সেজন্যে ধরে নিতে হবে, প্রতিটি নতুন চক্রের ভৌত অবস্থা এত চরম যে আগের চক্রের কোনো তথ্য পরের চক্রে পৌঁছতে পারে না। আগের সব ভৌত বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়। সব প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত, মহাবিশ্ব একেবারে নতুন করে জন্মলাভ করে।

এমন একটি মডেলে আকর্ষণীয় কোনো দিক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রতিটি চক্র ভৌতভাবে অন্য চক্র থেকে আলাদা হয়ে থাকলে এক চক্রের পরে আরেক চক্র আসে—এমন কথা বলার কি কোনো অর্থ থাকে? বাস্তবতে প্রতিটি চক্রই আলাদা আলাদা মহাবিশ্ব। এভাবেও তো বলা যায় যে এগুলো একের পর এক না থেকে অবস্থান করে সমান্তরালে। এই অবস্থাটি পুনর্জন্মবাদের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে প্রতিটি মানুষ আগের জন্মের কথা ভুলে যায়। তাহলে কোন অর্থে বলা যাবে যে আগের মানুষটির পুনর্জন্ম হয়েছে?

আরেকটি সম্ভাবনা হলো, কোনোভাবে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে। ফলে পেছনে ঘোরার সময় নতুন করে ঘড়ি নতুন করে শুরু হচ্ছে। দ্বিতীয় সূত্র যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাবে সেটার ক্ষতপূরণ সম্পর্কে এটি তাহলে কী বলছে? সূত্রটির একটি বাস্তব উদাহরণ দেখা যাক। বোতল থেকে সুগন্ধির উবে যাওয়ার কথাই ধরুন না। সুগন্ধির আচরণ পাল্টে গেলে একটি আমূল পরিবর্তন ঘটবে। যেখানে ঘরে প্রতিটি কোণায় অবস্থান করা সুগন্ধির অণুগুলো ফিরে আসবে বোতলে। চলচ্চিত্র চলবে উল্টো দিকে। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র থেকেই আমরা অতীত ও ভবিষ্যতের পার্থক্য বুঝতে পারি। যার নাম সময়ের তীর। তার মানে এই সূত্রের ব্যত্যয় ঘটলে সময় চলতে শুরু করবে উল্টো দিকে।

বিপর্যয় চলে এলে সময় পেছনে চলতে শুরু করবে মনে করাটা মহাজাগতিক মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার কিছুটা সাদামাটা একটি কৌশল। সময় খারাপ হয়ে গেলে মহাজাতিক চলচ্চিত্রটাকে পেছন দিকে চালিয়ে দাও, ব্যস! তবে এই চিন্তাটাকেও অনেক কসমোলজিস্ট গ্রহণ করেছেন। ১৯৬০ এর দশকে জ্যোতির্পদার্থবিদ থমাস গোল্ড এমন একটি প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, পুনরায় সঙ্কোচনশীল মহাবিশ্বের সঙ্কোচন দশায় মহাবিশ্ব হয়ত পেছনে চলতে শুরু করবে। তিনি মনে করিয়ে দেন, এর ফলে কিন্তু সেই সময় জীবিত থাকা প্রাণীদের মস্তিষ্কও পেছনে চলবে। ফলে তাদের কাছে সময়ের ধারণাও বিপরীত হয়ে যাবে। ফলে সঙ্কোচনশীল মহাবিশ্বের প্রাণীরা তাদের চারপাশের সবকিছুকে পেছনে চলতে দেখবে না। বরং আমাদের মতোই সবকিছুকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখবে। যেমন, তারা মনে করবে মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত নয়, প্রসারিত হচ্ছে। তাদের চোখে মনে হবে, আমাদের সময়ের মহাবিশ্বই সঙ্কুচিত হচ্ছিল। আর আমাদের মস্তিষ্কই কাজ করছিল বিপরীত দিকে।

১৯৮০'র দশকে স্টিফেন হকিংও সময়ের উল্টো দিকে ঘোরা নিয়ে কিছুটা মজা করেন। পরে সেই চিন্তা থেকে সরে আসেন। আর বলেন, সেটা ছিল তার সবচেয়ে বড় ভুল। প্রথমের হকিংয়ের বিশ্বাস ছিল, চক্রাকার মহাবিশ্বে কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রয়োগ করতে গেলে বিস্তারিত সময় প্রতিসাম্য দরকার হবে। পরে দেখা গেল, বিষয়টা তেমন নয়। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আদর্শ সূত্রায়ন অন্তত এমনি বলে। সম্প্রতি মারে গেল ম্যান ও জেমস হার্টল কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্রগুলোকে একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করেছেন। এখানে তারা সময় প্রতিসাম্য যুক্ত করেছেন। এরপর প্রশ্ন রেখেছেন, এই অবস্থা আমাদের মহাজাগতিক সময়কালে পর্যবেক্ষণযোগ্য কোনো প্রভাব রাখবে কি না। এখন পর্যন্ত এর উত্তর পরিষ্কার নয়।

মহাজাগতিক বিপর্যয় এড়ানোর সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি উপায় বলেছেন রুশ পদার্থবিদ আন্দ্রেই লিন্ডে। তৃতীয় অর্ধায়ে আলোচিত স্ফীতি তত্ত্বকে বিস্তৃত করে উপায়টি ভাবা হয়েছে। মূল স্ফীতি তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে খুব প্রারম্ভিক মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম অবস্থা একটি নির্দিষ্ট উত্তেজিত ভ্যাকুয়ামে সাথে সম্পর্কিত। যার প্রভাবে কিছু সময় ধরে ব্যাপক প্রসারণ ঘটেছিল। ১৯৮৩ সালে লিন্ডে বলেন, একেবারে প্রাথমিক মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম অবস্থা বরং বিশৃঙ্খল উপায়ে জায়গাভেদে আলাদা হতে পারে। কোথাও নিম্ন শক্তি, কোথাও মোটামুটি উত্তেজিত অবস্থা, কোথাও আবার অনেক বেহসি উত্তেজিত ইত্যাদি। উত্তেজিত অঞ্চলে স্ফীতি ঘটে। এছাড়াও কোয়ান্টাম অবস্থার আচরণ নিয়ে লিন্ডের করা হিসেবে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, অতি উত্তেজিত অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি স্ফীতি ঘটে। আর ক্ষয় ঘটে সবচেয়ে কম। তার মানে কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল যত বেশি উত্তেজিত থাকবে সেটি তত বেশি স্ফীত হবে। বোঝাই যাচ্ছে, খুব অল্প সময় সময় পরেই যে অঞ্চলে ঘটনাক্রমে শক্তি বেশি ও স্ফীতি সবচেয়ে দ্রুত ঘটেছে সেটি খুব তাড়াতাড়ি স্ফীত হয়ে মোট স্থানের বেশিরভাগ অংশ দখল করে ফেলবে। লিন্ডে বিষয়টাকে ডারউইনীয় বিবর্তন বা অর্থনীতির সাথে তুলনা করেন। কোনো স্থানের খুব উত্তেজিত একটি অবস্থার একটি সফল কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের ফলে সেই স্থানের আয়তন হুট করে অনেক অনেক বেড়ে যাবে। যদিও সে জন্যে প্রচুর শক্তি ধার করতে হবে। ফলে ধার করা শক্তির এই অতিস্ফীত অঞ্চলগুলোই মহাবিশ্বে বেশি থাকবে।

বিশৃঙ্খল এই স্ফীতির কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই মহাবিশ্ব অনেকগুলো ছোট ছোট মহাবিশ্বের বা বুদ্বুদের একটি গুচ্ছে পরিণত হবে। কিছু কিছু স্ফীতি হবে পাগলে মতো। কিছু কিছু আবার একটুও স্ফীত হবে না। নিছক এলোমেলো ফ্লাকচুয়েশনের কারণে কিছু কিছু এলাকায় অনেক বেশি উত্তেজিত শক্তি থাকবে। ফলে সেইসব এলাকায় প্রাথমিক সূত্রে যতটা মনে করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি স্ফীতি হবে। আবার এই স্থানগুলোই সবচেয়ে বেশি স্ফীত হবে বলে স্ফীতি-উত্তর মহাবিশ্ব থেকে দৈবভাবে একটি বিন্দু বাছাই করলে সেটি খুব স্ফীত অঞ্চলে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। অতএব মহাশূন্যে আমরা হয়ত অতিস্ফীত একটি অঞ্চলের গভীরে অবস্থিত আছি। লিন্ডের হিসেব অনুসারে, বড় বুদ্বুদ হয়ত ১০ ১০^৮ গুণ বড় হয়েছে। মানে ১ এর পরে ১০ কোটি শূন্য দিলে যে সংখ্যা হয় তত গুণ।

অসীম সংখ্যক অতিস্ফীত বুদ্বুদের মধ্যে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। ফলে বড় মাপকাঠিতে চিন্তা করলে আমাদের মহাবিশ্বকেও ব্যাপক বিশৃঙ্খল মনে হবে। আমাদের বুদ্বুদটি বর্তমানে পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের চেয়ে অনেক অনেক বড়। বুদ্বুদের অভ্যন্তরে পদার্থ ও শক্তি প্রায় সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকবে। কিন্তু বুদ্বুদের বাইরে থাকবে অন্য আরও বুদ্বুদ। এছাড়াও থাকবে এমন অঞ্চল, যেখানে এখনও স্ফীতি চলছে। আসলে লিন্ডের মডেলে স্ফীতি কখনোই থামে না। সবসময়ই কোনো না কোনো স্থানে স্ফীতি চলতেই থাকে। অন্য বুদ্বুদ তৈরি হতে থাকে। যদিও ততক্ষণে অন্য বুদ্বুদরা জীবনকাল শেষ করে মরে যাচ্ছে। ফলে এটাও এক ধরনের চিরন্তন মহাবিশ্ব। আগের অধ্যায়ে আলোচিত শিশু মহাবিশ্বের মতো অনেকটা। যেখানে জীবন, আশা ও মহাবিশ্বরা প্রতিনিয়ত জন্মলাভ করে। স্ফীতির মাধ্যমে নতুন বুদ্বুদ মহাবিশ্ব তৈরি চলতেই থাকে। এর হয়ত কোনো নির্দিষ্ট সূচনা ছিল না। অবশ্য এটা নিয়ে বর্তমানে কিছু বিতর্ক আছে।

অন্য বুদ্বুদের উপস্থিতির কারণে আমাদের বংশধররা কি টিকে থাকার অনুকূল পরিবেশ পাবে? তারা কি মারা যাবের আগে আগে অন্য নতুন বুদ্বুদে সরে গিয়ে মহাজাগতিক বিপর্যয়, বা আরও সঠিক করে করে বললে বুদ্বুদীয় বিপর্যয়, থেকে রক্ষা পাবে? লাইফ অ্যান্ড ইনফ্লেশন নামে একটি বীরোচিত গবেষণাপত্রে লিন্ডে এই বিষয়টি আলোচনা করেন। এটা প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালের ফিজিক্স লেটারস জার্নালে। তিনি বলেন, “এই ফলাফলগুলো বলছে, স্ফীতি মহাবিশ্বে জীবনের অবসান কখনও হবে না। দূর্ভাগ্য হলো, এটা থেকে বলে দেওয়া যাচ্ছে না যে মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা খুব আশাবাদী হতে পারব। যেকোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা বুদ্বুদই ধীরে ধীরে বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। ফলে টিকে থাকার একমাত্র কৌশল হবে ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এলে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে চলে যাওয়া।"

লিন্ডের স্ফীতি তত্ত্বে একটি হতাশাজনক দিক আছে। সেটা হলো একটি আদর্শ বুদ্বুদ অনেক অনেক বড়। তাঁর হিসাব মতে, আমাদের সবচেয়ে কাছের বুদ্বুদ এত দূরে আছে যে আলোকবর্ষ এককে তা প্রকাশ করতে হলে ১ এর পরে কয়েক মিলিয়ন শূন্য বসাতে হবে। এটা এত বড় সংখ্যা যে একে লিখতে গেলে পুরো একটি বিশ্বকোষের পাতা শেষ হয়ে যাবে। আলোর বেগের কাছকাছি বেগে গেলেও এই দূরত্ব পাড়ি দিতে প্রায় একই পরিমাণ বছর সময় লাগবে। যদি না সৌভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের বুদ্বুদের একেবারে প্রান্তের দিকে অবস্থান করে থাকি। এটাও সম্ভব হবে যদি আমাদের মহাবিশ্ব অনুমিত পদ্ধতিতে প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমান সময়ে প্রকট ভূমিকা রাখা পদার্থ ও বিকিরণ অসীম পরিমাণ হালকা হয়ে গেলে বর্তমানে একেবারেই বোঝা সম্ভব নয় এমন সবচেয়ে সূক্ষ্ম কোনো ভৌত প্রভাবের ওপরই হয়ত শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্ব্বের প্রসারণে কৌশল নির্ভর করবে। যেমন ধরুন, স্ফীতি বলের খুব দুর্বল একটি ধ্বংসাবশেষ মহাবিশ্বে থেকে গেল। মহাকর্ষের কারণে যেটা এখন একেবারে থমকে আছে। কিন্তু বুদ্বুদ থেকে পালাতে আমাদের যে পরিমাণ সময় লাগবে তাতে হয়ত সেই ধ্বংসাবশেষ আবার লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে হয়ত যথেষ্ট দীর্ঘ সময় পর মহাবিশ্ব আবারও স্ফীত হতে শুরু করবে। বিগ ব্যংয়ের পরের সেই সময়ের মতো এত প্রচণ্ডভাবে নয়। বরং খুব ধীরে। বলা যায় যে বিগ ব্যাংএর একটি ক্ষীণ নমুনার মতো। কিন্তু ক্ষীণ এই প্রভাব দুর্বল হলেও এটা চলবে অনন্তকাল। মহাবিশ্বের বৃদ্ধির খুব ধীরে ধীরে বাড়লেও বড় হয়ে যাওয়ার এই হার বেড়ে যাওয়ার ভৌত প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রভাবে বুদ্বুদের মধ্যেই একটি ঘটনা দিগন্ত্বের উদয় হবে। যেটাকে অনেকটা দেখতে ব্ল্যাক হোলের মতো মনে হবে, যার ভেতরটা থাকবে বাইরের দিকে। এটি একটি ফলপ্রসূ ফাঁদ হিসেবে কাজ করবে। তখনও বেঁচে থাকা যেকোনো জীব আমাদের বুদ্বুদের ভেতরের অসহায়ভাবে আটকে থাকবে। কারণ তারা যতই বুদ্বুদের বাইরের দিকে যেতে থাকবে, বুদ্বুদের প্রান্ত স্ফীতির প্রভাবে ততই দ্রুত আরও সরে যেতে থাকবে। লিন্ডের হিসাব-নিকাশ একটু কাল্পনিক। তবে এখানে খুব সুন্দর করে দেখানো আছে যে মানুষের চূড়ান্ত নিয়তি হয়ত খুব ক্ষুদ্র ভৌত প্রভাবের ওপর নির্ভর করবে। সে প্রভাব এত ছোট যে মহাজগাতিক পর্যায়ে সেটির বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়ার আগে আমরা তাকে শনাক্তও করতে পারব না।

কিছু দিক থেকে ভাবলে লিন্ডের কসমোলজি পুরাতন স্থিরাবস্থা তত্ত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের শুরুতে তত্ত্বটি খুব জনপ্রিয় ছিল। মহাবিশ্বের সমাপ্তি এড়ানোর জন্যে এটা এখনও সবচেয়ে সরল ও আকর্ষণীয় তত্ত্ব। এর মূল সংস্করণের প্রস্তাবক হলেন হারম্যান বন্দি ও থমাস গোল্ড। এই তত্ত্বের মতে, বড় কাঠামোতে সবসময় মহাবিশ্ব অপরিবর্তিত থাকে। ফলে এর কোনো শুরু বা শেষ নেই। প্রসারণের সাথে সাথে এর ফাঁকা স্থানে নতুন নতুন পদার্থ তৈরি হয়। সবসময় একটি নির্দিষ্ট ঘনত্ব বজায় থাকে। ছায়াপথদের নিয়তি আমি আগের অধ্যায়গুলোতে যেমন বলেছি তেমনই: জন্ম, বিবর্তন ও মৃত্যু। কিন্তু অপরিসীম নতুনসৃষ্ট পদার্থ থেকে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন ছায়াপথ। ফলে প্রত্যেক যুগেই মহাবিশ্বের সাধারণ চেহারা সার্বিকভাবে একই থাকে। একটি নির্দিষ্ট আয়তনের স্থানে ছায়াপথের সংখ্যা সবসময় সমান থাকে, যাদের একেকটির বয়স একেক রকম।

শুরুতে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব কীভাবে এল এই প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে স্থিরাবস্থা তত্ত্ব শেষ হয়ে যায়। এই তত্ত্বে বিবর্তনের মাধ্যমে মহাজাগতিক অবিনশ্বরতার সাথে মজার বৈচিত্র্যের সমন্বয় করা হয়েছে। আসলে এটি আরও এক ধাপ সামনেও যায়। কারণে একেকটি ছায়াপথ ধীরে ধীরে মরে গেলেও সার্বিকভাবে মহাবিশ্ব কখনও বৃদ্ধ হয় না। আমাদের উত্তরপুরুষদেরকে মাটি খুঁড়ে ক্রমেই কমে যাওয়া জ্বালানির খোঁজ করতে হবে না। এক ছায়াপথ পুরাতন হয়ে গেলে শুধু আরেক ছায়াপথে চলে যেতে হবে এই যা। এটা চলতে পারে অনন্তকাল পর্যন্ত। সবসময় থাকবে একইরকম তেজ, বৈচিত্র্য ও সক্রিয়তা।

তবে এটাকে কাজ করতে হলে কিছু ভৌত শর্ত পূরণ হতে হয়। প্রসারণের কারণে কয়েক শ বছর পরপর মহাবিশ্বের আকার দ্বিগুণ হয়। ঘনত্বকে একই থাকতে হলে এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১০৫০ টন নতুন পদার্থ প্রয়োজন। দেখে একে অনেক বেশি মনে হয়। কিন্তু এর মানে হলো প্রতি শতকে বিমানের গ্যারেজের আকারের স্থানে গড়ে একটি পরমাণু সৃষ্টি। এমন ঘটনা আমাদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুব কম। এভাবে পদার্থ তৈরি হওয়ার ভৌত প্রক্রিয়ার আরও বড় একটি সমস্যা আছে। একেবারে কম করে হলেও আমাদেরকে তো জানতে হবে বাড়তি ভরের যোগান দেওয়া সেই শক্তি কোত্থেকে আসবে তা জানতে হবে। আর কেনইবা এই শক্তি কখনও ফুরিয়ে যাবে না। ফ্রেড হয়েল ও তাঁর সহকর্মী জয়ন্ত নারলিকার এই সমস্যা নিয়ে কাজ করনে। তাঁরা দুজনই স্থিরাবস্থা তত্ত্বকে বিস্তারিত রূপ দান করেন। শক্তির সরবরাহের জন্যে তাঁরা সৃষ্টি ক্ষেত্র নামে নতুন ধরনের একটি ক্ষেত্র প্রস্তাব করেন। ধরে নেওয়া হয়েছিল, শক্তি ক্ষেত্রের নিজের থাকবে ঋণাত্মক শক্তি। m ভরের পদার্থের প্রতিটি নতুন কণার আবির্ভাবের সাথে সাথে শক্তি ক্ষেত্রে -mc2 পরিমাণ শক্তি জমা হবে।

শক্তি ক্ষেত্রের ধারণার সাহায্যে শক্তির যোগান সমস্যার পদ্ধতিগত সমাধান হলো। কিন্তু অনেক প্রশ্ন থেকে গেল অমীমাংসিত। এছাড়াও সমাধানটি নিছক প্রয়োজনের খাতিরেই তৈরি বলে মনে হচ্ছিল। এই রহস্যময় ক্ষেত্রের অন্য কোনো বহিঃপ্রকাশ ছিল না। এর চেয়ে বড় কথা হলো, ১৯৬০ এর দশকে পর্যবেক্ষণ চলে যাচ্ছিল তত্ত্বটির বিপক্ষে। বিপক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মহাজাগতিক পটভূমি তাপীয় বিকিরণের আবিষ্কার। সুষম এই পটভূমিকে সহজেই বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু স্থিরাবস্থা তত্ত্বে এর ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল। এছাড়াও দূর আকাশের ছায়াপথ ও বেতার ছায়াপথের২ জরিপ থেকে বড় কাঠামোতে মহাবিশ্বের পরিবর্তনের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা পরিষ্কার হয়ে গেলে ফ্রেড ও তাঁর সহকর্মীরা স্থিরাবস্থা তত্ত্বের সরল রূপ পরিহার করেন। অবশ্য মাঝেমধ্যে তত্ত্বটির আরও জটিল রূপের সাময়িক উদয় ঘটে।

ভৌত ও পর্যবেক্ষণমূলক সমস্যা বাদ দিলেও স্থিরাবস্থা তত্ত্ব কিছু আগ্রহোদ্দীপক দার্শনিক সমস্যার জন্ম দেয়। যেমন ধরুন, আমাদের বংশধররা হাতে অসীম সময় ও সম্পদ পেলে তাদের প্রযুক্তিগত উন্নতির কোনো সুস্পষ্ট সীমা থাকবে না। পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে তাদের সামনে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। ক্রমেই আরও বড় আয়তনের স্থান হবে তাদের করায়ত্ব। ফলে খুব দূরের ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের বড় একটি অংশ প্রযুক্তির দখলে আসবে। কিন্তু প্রস্তাবনা বলছে, মহাবিশ্বের বড় কাঠামোর বৈশিষ্ট্য সময়ের সাথে সাথে অপরিবর্তিত থাকবে। ফলে স্থিরাবস্থা তত্ত্ব বলছে, আমাদের বর্তমান মহাবিশ্ব ইতোমধ্যে প্রযুক্তির করায়ত্বে চলে এসেছে। স্থিরাবস্থার মহাবিশ্বে ভৌত অবস্থাগুলো সব যুগেই সার্বিকভাবে একই রকম বলে সব যুগেই বুদ্ধিমান প্রাণীদের আবির্ভাব সকল যুগেই হওয়ার কথা। আর যেহেতু এই প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে চলছে, সে কারণে এমন কিছু সম্প্রদায় থাকা উচিত যারা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে টিকে আছে। ফলে তারা প্রযুক্তি খাটিয়ে অনেক বিপুল পরিমাণ আয়তনের স্থান করায়ত্ব করার কথা। যার মধ্যে থাকবে মহাবিশ্বের আমাদের অঞ্চলটাও। বুদ্ধিমান প্রাণীরা মহাবিশ্ব দখল করতে চায় না বলে এই ফলাফল এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। অপরিসীম সময় আগে যেকোনো একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাবই এমন ফলাফলের জন্যে যথেষ্ট। এর সাথে প্রাচীন একটি ধাঁধাঁর মিল আছে: অসীম মহাবিশ্বে যে ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা খুব কম সেটিও এক দিন না এক দিন ঘটবে। তাও একবার দুবার নয়। অসীমসংখ্যক বার। যুক্তির ধারা বেয়ে চলতে চলতে আমরা পৌঁছে যাই সেই তিক্ত উপসংহারে: স্থিরাবস্থা তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্বে সংঘটিত প্রক্রিয়াগুলো অবিকল এর অধিবাসীদের প্রযুক্তিগত কার্যক্রমের মতো। আমরা যাকে প্রকৃতি বলি সেটা আসলে একটি বা একদল মহাপ্রাণীর কর্ককাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। একে দেখে মনে হচ্ছে প্লেটোর ডেমিয়ার্জের একটি রূপ। ডেমিয়ার্জ হলো একটি দেবতা যে বেঁধে দেওয়া ভৌত সূত্রের সীমার মধ্যে থেকে কাজ করে। মজার ব্যাপার হলো, হোয়েল তাঁর শেষের দিকের মহাজাগতিক তত্ত্বগুলোতে এমন মহাপ্রাণীদের কথা সমর্থন করে গেছেন।

মহাবিশ্বের সমাপ্তি নিয়ে কথা উঠলেই তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন আসে। আমি আগেই বলেছি, মহাবিশ্বের মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখে বার্ট্রান্ড রাসেল মানুষ অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ। স্টিভেন উইনবার্গও সম্প্রতি এ মত পোষণ করেছেন। তার দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস বইয়ের শেষের উপসংহার হলো, “মহাবিশ্বকে যতটা বেশি বোঝা যাচ্ছে, ততই অর্থহীন মনে হচ্ছে।" আমি বলেছি, ধীরে ধীরে মহাজাগতিক তাপীয় মৃত্যুর ভয়কে বড় করে দেখানো হয়েছে। হয়ত ভুলও করা হয়েছে। অবশ্যও মহাসঙ্কোচনের মাধ্যমে মৃত্যু হলেও হতে পারে। আমি মহাপ্রাণীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছু অনুমান করেছি। যারা বিস্ময়কর ভৌত ও বুদ্ধিগত অর্জন দিয়ে প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারে। এছাড়াও আমি সংক্ষেপে চিন্তার সীমাহীনতা নিয়ে আলোচনা করেছি। যদিও মহাবিশ্বের সীমা থাকলেও থাকতে পারে।

কিন্তু বিকল্প এই চিত্রগুলো আমাদের হতাশ দূর করতে সক্ষম কি? একবার আমার এক বন্ধু বলল, স্বর্গ সম্পর্কে সে যা শুনেছে তাতে তার আগ্রহবোধ আসেনি। তার মতে, অনন্তকাল ধরে মহিমান্বিত ভারসাম্যপূর্ণ জীবন হবে আকর্ষণহীন। এর চেয়ে দ্রুত মরে গিয়ে অনন্ত জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়াই ভাল। অমরত্বের জীবনে যদি একই চিন্তা ও অভিজ্ঞতাই ফিরে ফিরে ভগ করতে হয় তাহলে তা সত্যিই অর্থহীন। কিন্তু অমরত্বের সাথে যদি উন্নতি যুক্ত হয়, তাহলে আমরা চিরন্তন নতুনত্বে বসবাসের কথা কল্পনা করতে পারি। সবসময় নতুন ও রোমাঞ্চকর কিছু করা ও শেখা যাবে। সমস্যা হলো, তার উদ্দেশ্য কী হবে? মানুষ একটি প্রকল্প হাতে নিলে তার পেছনে থাকে উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে প্রকল্প হয় ব্যর্থ (যদিও লব্ধ অভিজ্ঞতার মূল্য আছে) অন্য দিকে লক্ষ্য অর্জিত হলে প্রকল্প সফল। আর কার্যক্রম হবে সমাপ্ত। যে প্রকল্প কখনও শেষ হবে না তার কি কোনো সত্যিকার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে? অস্তিত্বের স্বরূপ যদি হয় কখনও পৌঁছতে না পারা এক গন্তব্য, তবে কি তাকে অর্থবহ বলা যাবে?

মহাবিশ্বের কোনো উদ্দেশ্য থাকলে আর সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হলে মহাবিশ্বের সমাপ্তি ঘটতেই হবে। কারণ, তখনও এর অসিত্ব অবিরাম থাকা হবে ভিত্তিহীন ও নিরর্থক। অন্য দিকে মহাবিশ্ব চিরকাল টিকে থাকলে এর কোনো চূড়ান্ত উদ্দেশ্য আছে কল্পনা করা কঠিন। ফলে মাহাজাগতিক সফলতার বিনিময় হয়ত মহাজাগতিক মূল্য দিয়ে দিতে হবে। আমরা সর্বোচ্চ যেটা আশা করতে পারি তা হলো, আমাদের বংশধররা হয়ত শেষ তিন মিনিটের আগেই মহাবিশ্বের উদ্দেশ্য জানতে পারবে।

অনুবাদকের নোট

১। ফিনিক্স মূলত গ্রিক রূপকথার একটি পাখি, যা চক্রাকারে একের পর এক এর পূর্বপুরুষের ছাই থেকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

২। বর্ণালীর বেতার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অংশে যে গ্যালাক্সিগুলো খুব উজ্জ্বল তাদের নাম বেতার ছায়াপথ। ১০ মেগাহার্টজ থেকে ১০০ গিগাহার্টজ কম্পাঙ্কে এদের দীপ্তি ১০৩৯ ওয়াট পর্যন্ত হয়।

পরিশিষ্ট (অনুবাদক)

ক) সময় কেন পেছনে চলে না?

খ) এক নজরে মহাবিশ্বের সম্ভাব্য পরিণতিগুলো

গ)